Journal of Rajshahi College, **Vol. 1, Nos. 1 & 2, 2023, pp. 227-241**

মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ* কাব্য: আধুনিকতার শিল্পস্বর

নূর সালমা খাতুন*

Abstract

বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি, বিপ্লবী কবি, যুগন্ধর মাইকেল মধুসূদন দত্ত। হাজার বছরের পয়ারের মেলবন্ধন থেকে কেবল বাংলা সাহিত্যকে মুক্তি দেননি বিষয়গতও বেশ পরিবর্তন আনেন। পৌরাণিক সব চরিত্রের মধ্যে আধুনিক মানুষকে উপস্থাপন করেন। তাই মধুসূদনের কলমে বাংলা সাহিত্য নতুন রূপ ও নতুন চেতনা লাভ করে। ঐতিহ্যের সঙ্গে বাস্তবতার মিশেলে এক অভিনব সাহিত্যিক রসের সৃষ্টি করেন মধু কবি। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে যে আলোর প্রবেশ ঘটান, মধুসূদন সেই আলোকে অক্ষয় রূপ দেন সাহিত্যে। আধুনিকতার সকল বৈশিষ্ট্যকে রূপায়িত করে রচনা করেন *মেঘনাদবধ কাব্য*। যার শিল্পস্বর সেদিনের বাংলা সাহিত্যে একেবারে নতুন। মধুসূদন প্রাচ্যের প্রচলিত এবং জনপ্রিয় এক মিথকে পুনর্নির্মাণ করেন এই কাব্যে। যেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলন ঘটেছে, কিন্তু রাজত্ব করেছে বাঙালিয়ানা। নিজের সমাজ ও সংস্কৃতিকে অমর করে রেখেছেন এই কাব্যে। জীবন এখানে শতধারায় কথা বলেছে। পুরাণকথিত রাক্ষসরাজ রাবণ মধুসূদনের হাতে একজন প্রজাবৎসল, দেশপ্রেমিক, সংবেদনশীল ব্যক্তিচরিত্রে পরিণত হয়েছে। *মেঘনাদবধ কাব্যের* মূল আখ্যান মূলত রাবণের পাপের প্রায়শ্চিত্তের উপর লিখিত। কিন্তু এখানে পাপের প্রসঙ্গ আসলেও রাবণকে পাপবোধে তাড়িত হতে দেখা যায় না। বরং এখানে সোনার লঙ্কাপুরী দেবতাদের আশীর্বাদপুষ্ট রাম-লক্ষ্মণের হাতে বীরশূন্য হয়ে পড়ে। আর এক মানুষিক হাহাকারে বিদীর্ণ রাবণ যেন আধুনিক ব্যক্তিমানুষকে উপস্থাপন করে। মেঘনাদ বা রাবণের পরাজয় বিধির লিখনের কারণে ঘটলেও শেষাবধি তারা জিতে যায়। আসলে জিতে যায় জীবন, প্রবল শক্তিধর নিয়তির সঙ্গে লড়াই করা জীবন। মধুসূদন জীবনকেই রূপায়ণ করেন এক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। এই লেখায় *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর সেদিকটাকে অর্থাৎ তার শিল্পস্বরের আধুনিকতাকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

Keywords: *আধুনিকতা, নবজাগরণ, পুরাণ, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, নিয়তি*

"জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে।"[১]

---

* ড. নূর সালমা খাতুন, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী-৬০০০, বাংলাদেশ, ই-মেইল: nursalma.sohel@gmail.com

♦ **Article r**eceived on 17 September 2023 & accepted on 15 October 2023.

To cite this article: খাতুন, নূর সালমা (২০২৩)। মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ* কাব্য: আধুনিকতার শিল্পস্বর। *Journal of Rajshahi College,* 1(1 & 2), 227-241.

[১] বিষ্ণু বসু ও তীর্থপতি দত্ত (সম্পা.), *মধুসূদন রচনাবলী* (কলকাতা: তুলি-কলম, ১৯৯৯), পৃ. ৩৯।

এই কথা মধুকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩ খ্রি.) *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১ খ্রি.) রাবণের। বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়কর প্রতিভা, আধুনিকতার প্রাণপুরুষ মধুসূদন এই অর্থে প্রথম বিপ্লব এনেছেন সাহিত্যে, বিদ্রোহ করেছেন সাহিত্যের আঙ্গিকের ব্যাপারে। হাজার বছরের পুরানো পয়ার ছন্দকে ভেঙে প্রতিষ্ঠা করলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দের। আর প্রাচ্যের পুঞ্জীভূত বিশ্বাসের জায়গা অর্থাৎ রামায়ণ রিকনস্ট্রাক্ট করলেন। তৈরি করলেন আজকের দিনের উপযোগী এক ট্রাজিক কাব্য। যেখানে ব্যক্তির লড়াই নিজের সঙ্গে, কখনোবা প্রবল শক্তিধর নিয়তির সঙ্গে। মধুসূদন ধর্মীয় আবরণ থেকে একভাবে বাংলা সাহিত্যকে মুক্ত করলেন। তাঁর *মেঘনাদবধ কাব্যের* চরিত্ররা কেবল অবয়বে কিংবা বলা যায় নামে পৌরাণিক, কিন্তু তাদের Doing এবং Suffering আধুনিক মানুষের। পুরাতনের খোলসে একেবারে নতুন মানুষ। যারা এক অর্থে সম্পূর্ণ অপরিচিত বাংলা সাহিত্যের ভুবনে। কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের হিসেবে নতুন নয়। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৯৭২-১৭৬০ খ্রি.), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯ খ্রি.) যে জীবনের কেবল ছায়া দেখিয়েছেন, মধুসূদন তাঁর লেখায় তাদের আকার দেন, ভাষা দেন, ভাবনা দেন। গড়ে তোলেন বিচারবোধ আর আবেগে ভরপুর পরিপূর্ণ মানুষ। প্রশ্ন হচ্ছে মধুসূদন ঠিক কোন জায়গার উপর দাঁড়িয়ে এভাবে ভাবতে পারলেন? ডিরোজিওর শিষ্য মধুসূদন উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসকে কী সর্বস্ব দিয়ে অনুভব করেছিলেন? রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.)-এর হাত ধরে যে পরিবর্তনের স্রোত বয়ে গিয়েছিল অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন সমাজের উপর দিয়ে তার প্রভাব হয়তো মধুসূদনের গড়ে ওঠায় ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু এটাই যথেষ্ট ছিল না। বারো-তেরোটি ভাষা জানা মধুসূদন পরিভ্রমণ করেছেন বিশ্বসাহিত্যে। সেখান থেকে আহরিত অনুভবকে নিজের প্রজ্ঞায় মিশিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাঁর বিশ্ব। যেখানে মানুষেরা অভিনব, অন্তত বাংলা সাহিত্যের ভুবনে। তবে মধুসূদন এবং তাঁর বিশ্ব নিয়ে বলা হয়:

> একটি পরাধীন দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশের এক গণ্ড গ্রামে জন্ম মধুসূদনের। অথচ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা, সকল প্রকার কুসংস্কার এবং প্রাদেশিকতার গণ্ডী অতিক্রম করে তিনি বাঙালি জীবন ও বাংলা সাহিত্যকে বিপুল বিশ্বের সাথে সংযোগ করেছেন– যে বিশ্বের স্থানিক ব্যাপ্তি গ্রীস থেকে বাংলাদেশ এবং কালিক পরিধি প্রায় তিন হাজার বছরের। ফলে বাংলাদেশের মানুষও বাংলা সাহিত্যে এক বৃহৎ জগতে উপনীত হয়েছে।. . . মধুসূদন যে বিশ্ব নির্মাণ করেছেন এই বিশ্বে প্রতিটি মানুষ-পুরুষ ও নারী-স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, আত্মবলে বলীয়ান। এই বিশ্বে মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে–কোন আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক শক্তির কাছে সে হার মানতে রাজি নয়। এই বিশ্বে ব্যক্তিমানুষ আত্মবলে আত্মমর্যাদায় আত্মবিশ্বাসে ও আত্মপ্রত্যয়ে প্রোজ্জ্বল।[২]

মধুসূদনের বেশিরভাগ লেখাই (*শর্মিষ্ঠা*, *পদ্মাবতী*, *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য*) পৌরাণিক আখ্যানের আধারে সমর্পিত। *মেঘনাদবধ কাব্য*ও তার ব্যতিক্রম নয়। বিশ্বাসে, চেতনায়,

---

[২] মোবাশ্বের আলী, *মধুসূদনের বিশ্ব* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ৯।

জীবনবোধে সম্পূর্ণ আধুনিক হয়েও তিনি বারবার পুরাণের কাছে গেছেন। এ বিষয়ে একজন সমালোচক বলেন:

> মাইকেল বারবার পৌরাণিক কাহিনী বেছে নিয়েছেন। এ থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, তিনি পৌরাণিক জগতে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সেটা মোটেই ঠিক নয়। এমন কি, নতুন ভাষা ও ছন্দ এবং ভিন্নতর ভঙ্গিতে পৌরাণিক কাহিনী নতুন করে বলার লোভেও নয়। সত্যি বলতে কি, তাঁর মনোভাব ছিলো প্রাচীন জগৎ থেকে একেবারে আলাদা। কিন্তু তিনি ধ্রুপদী সাহিত্যের অত্যুৎসাহী পাঠক হিসেবে পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে একটা আশ্চর্য সৌন্দর্য দেখতে পেতেন। সেই সৌন্দর্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে পুরাণকে পরিবেশন করতে। তিনি পৌরাণিক কাহিনী বেছে নিয়েছিলেন, তার মধ্য দিয়ে তাঁর আধুনিক মানবিক মূল্যবোধকে প্রকাশ করার জন্যে। চতুর্দশ শতাব্দীর রেনেসান্সের পণ্ডিতরাও পুরোনো গ্রীক আর ল্যাটিন সাহিত্য চর্চা করেছিলেন। কিন্তু সেটা প্রাচীন কালে ফিরে যাবার জন্যে নয়, বরং সেই সাহিত্যের প্রচার এবং নতুন ব্যাখ্যার মাধ্যমে আধুনিক মানবিক মূল্যবোধকে প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে। তাঁদের হিউম্যানিস্ট বিশেষণের কারণ সেটাই। উনিশ শতকে যে-বঙ্গীয় রেনেসান্স হয়েছিলো বলে দাবি করা হয়, তার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রকাশ যাঁদের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করা যায়, তাঁদের একজন নিঃসন্দেহে মাইকেল মধুসূদন দত্ত।[৩]

আমরা মধুসূদনের *মেঘনাদবধ কাব্যের* অবয়বে চোখ রাখবো। তিনি পুরাণের পুনর্নির্মাণ কীভাবে করলেন যা আধুনিকতার এক বিস্ময়কর নন্দনভাষ্য হয়ে উঠল? মধুসূদন প্রাচ্যের কর্মনির্ভর একটা আখ্যানকে অঙ্গীকৃত করে আধুনিক মানুষের একছত্র আধিপত্যের বিস্তার ঘটালেন *মেঘনাদবধ কাব্যে*। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা আর কুসংকারের বিপরীতে আধুনিকতার কতকগুলো মানদণ্ড তৈরি করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে মানবতাবোধ, দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদী চেতনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, যুক্তিবাদিতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। যার সবগুলো প্রকাশ *মেঘনাদবধ কাব্যে* দেখা যায়। এই কাব্যের আখ্যানভাগ আমাদের সকলের জানা। নয় সর্গের কাব্যটি শুরু হয়েছে লঙ্কাপুরীর রাজা রাবণের হাহাকার দিয়ে। সম্মুখসমরে বীরপুত্র বীরবাহু দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে। আর শেষ হয়েছে এভাবে 'সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।।'[৪] মাঝে রাবণকে এক সংগ্রামমুখর রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। নিজ চোখে বীরবাহুর পাশাপাশি ইন্দ্রজয়ী পুত্র মেঘনাদের মৃত্যু দেখতে হয়েছে যার সঙ্গে সহমরণে গেছে পুত্রবধু প্রমীলা। সোনার লঙ্কাপুরী লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। রাবণের হাহাকার আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। তার বিমূঢ় মনোভাব আমাদের নিজেদের অসহায়তার কথা মনে করিয়ে দেয়। পুত্র বীরবাহুর বীরোচিত মৃত্যুদৃশ্য দূতের মুখে শুনে একজন বীর হিসেবে, গর্বে বুক ভরে গেছে রাবণের। তিনি বলেন, "... সাবাসি দূত! তোর কথা শুনি,/ কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে/

---

[৩] গোলাম মুরশিদ, *আশার ছলনে ভুলি* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩), ৪র্থ মুদ্রণ, পৃ. ২০৫।

[৪] বিষ্ণু বসু ও তীর্থপতি দত্ত (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৭।

সংগ্রামে?.... ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধারী! চল, সবে,/ চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্ জন,/ কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি/ বীরবাহু; চল, দেখি জুড়াই নয়নে।"[৫] কিন্তু পিতারূপী রাবণ শোকে মুহ্যমান হয়ে বলেন, "মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ; –/ 'যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার/ প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে/ সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে, ...পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী–/ তুমি হে জগত-পিতা, এ কি রীতি তব?/ হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র-কেশরী!/ কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?"[৬] ঠিক এখান থেকে একজন প্রজাবৎসল শাসকরূপেও আবির্ভূত হন দশানন। যখন বীরবাহুর মাতা চিত্রাঙ্গদা পুত্রশোকে কাতর হয়ে রাবণকে বলেন, "একটী রতন মোরে দিয়াছিল বিধি/কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে/রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি, . . . কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,/লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?"[৭] উত্তরে রাবণ বলেন, "এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা ললনে,/শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে/দিবা নিশি!...."[৮] রাবণের এই অনুভব একজন দেশপ্রেমিক, প্রজাবৎসল শাসকের। যার কাছে প্রতিটি সৈন্য পুত্রসম ভালোবাসার, স্নেহের।

সোনার লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করতে হলে অজেয়, অলঙ্ঘনীয় সমুদ্র অতিক্রম করতে হয়। রাবণ যখন দেখেন সেই সমুদ্র বাঁধা পড়েছে তখন বিস্ময়ে, অভিমানে, আক্ষেপে তিনি বলেন, "কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,/ প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!/ এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়/ তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,/ রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,/কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?"[৯] রাবণের এই আক্ষেপ আধুনিক মানুষের। যখন জীবনের সমীকরণ জটিলতার আচ্ছাদিত হয় তখন এভাবেই রক্তাক্ত হয় মানুষ। এখানে স্পষ্ট পুরাণকথিত পুণ্যবান রাম দেবতাদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে লঙ্কাপুরীতে আক্রমণ চালাতে এসেছে। উদ্দেশ্য স্ত্রী সীতাকে উদ্ধার করা। যাকে হরণ করে এনেছে রাবণ। আমাদের মনে পড়ে যায় 'হেলেন অব ট্রয়'-এর কথা। সুন্দরী নারী হেলেনের জন্য ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়। আর সীতার জন্য সোনার লঙ্কাপুরী ধ্বংস হয়। রাবণ কেন এমন কাজ করলেন? চিত্রাঙ্গদা বলেন, "কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি/ লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,/মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি!"[১০]

রামায়ণে বর্ণিত কারণ এখানেও উপস্থাপিত হয়েছে। বোন সূর্পণখার অপমানের প্রতিশোধ নিতে রাবণ সীতাকে হরণ করে আনে। কিন্তু ওখানে তো একটা অধর্ম ঘটেছে। যার প্রায়শ্চিত্ত

---

[৫] *তদেব*, পৃ. ৩৭-৩৮।
[৬] *তদেব*, পৃ. ৩৯-৩৯।
[৭] *তদেব*, পৃ. ৩৯-৪০।
[৮] *তদেব*, পৃ. ৪০।
[৯] *তদেব*, পৃ. ৩৯।
[১০] *তদেব*, পৃ. ৪০।

রাবণকে করতে হচ্ছে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে রাবণের অনেকটা 'সেক্সপিয়রিয়ন ট্রাজেডি'র শিকার। নিজের মধ্যেই তাঁর ভুল নিহিত ছিল। একে একে রাবণকে সব হারাতে হয়। অসময়ে জাগিয়েছে বলে ছোট ভাই কুম্ভকর্ণ অকালে প্রাণ হারায়। শেষ অবধি তিনি নিজে যুদ্ধে যাবেন বলে মনস্থির করলে তার ইন্দ্রজয়ী পুত্র মেঘনাদ এ খবর পান। তিনি স্ত্রী প্রমীলাকে রেখে চলে আসেন যুদ্ধযাত্রার জন্য। কিন্তু পিতা রাবণ তাকে প্রতিহত করতে চান পিতৃস্নেহের পাশে আবদ্ধ করে। বলেন, "রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস; তুমি/ রাক্ষস-কুল-ভরসা। এ কাল সমরে,/ নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা/ বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি/ কে কবে শুনেছে পুত্র, ভাসে শিলা জলে,/ কে কবে শুনেছে, লোকে মরি পুনঃ বাঁচে?"[১১] রাবণ যেন লড়াই করছে ওখানে ঈশ্বরের প্রতিনিধির সঙ্গে। লক্ষ্মণ মরে আবার বেঁচে যায় দেবতাদের কৌশলে। সমুদ্র বাঁধা পড়ে পাথরে। বীরপুত্র মেঘনাদ বলে, "কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,/ রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে/তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ ঘুষিবে জগতে।/ হাসিবে মেঘবাহন; রুষিবেন দেব/ অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে;/ আর এক বার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;/ দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি ঔষধে!"[১২] মেঘনাদের এই তেজোদীপ্ত এবং বীরোচিত প্রকাশের পাশে দ্বিতীয় সর্গের শেষে দেখা যায় রামের ম্রিয়মাণ রূপ। দেবতার বিশেষ আনুকূল্য তাকে দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞ করে তুলছে। রামায়ণের রামের সেই রূপকে এখানে ভিন্নভাবে দেখানো হয়েছে। কিছুটা অবীরোচিতই বলা যায়। যে অন্যের উপর ভরসা করে এই যুদ্ধে জেতার চেষ্টা করছে। মধুসূদন আত্মশক্তিতে বলীয়ান করে রামকে দেখাননি বরং সেটা রাবণ, মেঘনাদ–এদের মধ্যে রয়েছে। রয়েছে মেঘনাদের প্রেমময়ী পত্নী প্রমীলার মধ্যেও। স্বামীর জন্য প্রমোদ-উদ্যান থেকে লঙ্কাপুরীতে আসতে চাইলে সখি বাসন্তি বলে সেটা রাম ঘিরে রেখেছে। শুনে প্রমীলার সদর্ভ ঘোষণা- "কি কহিলি, বাসন্তি? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি/ বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,/ কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?/ দানবনন্দিনী আমি; রক্ষঃ-কুল-বধূ;/ রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,–/ আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?/ পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে;/ দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?"[১৩]

এখানে দুটো বিষয় লক্ষণীয়–প্রমীলার আত্মবিশ্বাস এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ। সে নিজের পরিচয়ে মেঘনাদের স্ত্রী বললেও শেষে বলেছে 'নিজ ভুজ বলে' সে লঙ্কায় প্রবেশ করবে। নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিষয়টি মধুসূদন এনেছেন তাদের আচরণের মধ্য দিয়ে। চিত্রাঙ্গদাকেও দেখা গেছে লঙ্কাধিপতিকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে। নারী হিসেবে এদের এই স্বতন্ত্র সত্তার বহিঃপ্রকাশ সেকালের বিচারে অভিনব এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রমীলা যুদ্ধে আহ্বান জানায় রামকে লঙ্কাপুরীর প্রবেশদ্বারে। রাম বিনা যুদ্ধে পথ ছেড়ে দেয়। রাবণভ্রাতা বিভীষণ শত্রুর পক্ষ নিয়েছে। এরও একটা ব্যাখ্যা আছে পুরাণে। কিন্তু এখানে

---

[১১] *তদেব*, পৃ. ৪৫।

[১২] *তদেব*।

[১৩] *তদেব*, পৃ. ৫৫-৫৬।

এটাই দেখানো হয়েছে রাবণকে ছেড়ে যাচ্ছে একে একে সবাই। যা-ই হোক, প্রমীলাকে লঙ্কায় প্রবেশের অনুমতি দিয়ে রাম বিভীষণকে বলে, "দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,/ রক্ষোবর! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি,/ মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে/ চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ।।"[১৪] পক্ষান্তরে বিভীষণ শত্রুপক্ষকে শোনায়, "উত্তরিলা বিভীষণ; "সত্য যা কাহিলে,/ হে, বীর-কুঞ্জর! যথা ধর্ম্ম জয় তথা।/ নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃ-কুল-পতি!/ মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি/ মেঘনাদ; কিন্তু তবু থাক সাবধানে।/ মহাবীর্য্যবতী এই প্রমীলা দানবী;"[১৫] এখানে একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। মেঘনাদ মারা যাবে। কিন্তু বিভীষণ সাবধানে থাকতে বলে মহাবীর্যবতী প্রমীলার থেকে। একটা বিষয় প্রবল শক্তিধর হওয়ার পরেও কেন যেন রাবণকে পরাজিত হতে হয়। নিজের ভাগ্যলিপি বদলাতে না পারার মতো একটা ব্যাপার ঘটে।

চতুর্থ সর্গে যাকে কেন্দ্র করে এসব যুদ্ধ-আয়োজন সেই সীতার প্রসঙ্গ আসে। মিথিলার রাজকন্যা বন্দিনী সীতাকে বিভীষণপত্নী সরমা দেখতে আসে। সে বলে, "... আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া/ সিন্দুর; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে/ দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে/ এ বেশ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাধিপতি!/ কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ! কেমনে হরিল/ ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি?"[১৬] রঘু-কুল-বধূ সীতা অবশ্য সরমাকে বলে, "... বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি বিধুমুখি!/ আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে/ আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল/ বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,/ চিহ্ন-হেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা–/ এ কনক-লঙ্কাপুরে–ধীর রঘুনাথে!"[১৭] এখানে সীতার বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সহানুভূতিশীল মনের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এই সর্গে মধুসূদন সীতা হরণের আখ্যানটা পাঠককে শোনাবেন বলে বেশ আয়োজন করে সরমাকে নিয়ে এসেছেন। এই অংশের আসলে কতটা প্রয়োজন সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে ভেবে মধুসূদন এক পত্রালাপে বলেন, "Perhaps the episode of Sita's abduction (Fourth book) should not have been admitted, since it is scarcely connected with the progress of the Fable. But would you willingly part with it?"[১৮]

এই অংশে সীতা সবিস্তারে সকল কাহিনি বর্ণনা করেন। কীভাবে সূর্পণখা এবং লক্ষ্মণের মধ্যে একটা তিক্ততা তৈরি হয় এতে রাক্ষসকুল প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে এবং সীতাকে হরণের জন্য মায়ার আশ্রয় নেয়। এসব আলেখ্য সীতা সরমাকে শোনান। রাবণ সীতার কাছে ছদ্মবেশে ক্ষুধার্থ অতিথি হয়ে আসে। সে বলে, "... 'ভিক্ষা দেহ, রঘুবধূ,/ (অন্নদা এ বনে তুমি!) ক্ষুধার্ত্ত অতিথে।'/ "আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি,/ কর-পুটে কহিনু,

---

[১৪] *তদেব*, পৃ. ৫৯-৬০।

[১৫] *তদেব*, পৃ. ৬১।

[১৬] *তদেব*, পৃ. ৬৪।

[১৭] *তদেব*।

[১৮] ক্ষেত্র গুপ্ত, *মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্যশিল্প* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮), পৃ. ১৫৩।

'অজিনাসনে বসি,/ বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে; অতি-/ ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,/ সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।' কহিল দুর্ম্মতি–/ (প্রতারিত রোষ আমি নারিনু বুঝিতে)/ 'ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে।/ দেহ ভিক্ষা; নহে কহ, যাই অন্য স্থলে।/ অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি,/ জানকি? রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে/ এ কলঙ্ক-কালি, তুমি রঘু-বধূ? কহ,/ কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে?/ দেহ ভিক্ষা; শাপ দিয়া নহে যাই চলি।/ দূরন্ত রাক্ষস এতে সীতাকান্ত-অরি–/ মোর শাপে।'–লজ্জা ত্যজি, হায় লো স্বজনি,/ ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে,–/ না বুঝে পা দিনু ফাঁদে; অমনি ধরিল/ হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি;"[১৯]

এখানে একটু বিস্তারিতভাবে রাবণের সীতা হরণের কৌশল উপস্থান করা হলো। যুদ্ধে কোনো ন্যায় কাজ করে না জেতাটায় বড় কথা। হয়তো রাবণ ভেবেছে বোনের প্রতিশোধ সে এভাবে নেবে। পথে তাকে পক্ষীরাজ জটায়ু আক্রমণ করে। তাকেও সে প্রতিহত করে অসীম তেজে। এখানে রাবণের বীরত্বকে মধুসূদন যেমন দেখান পাশাপাশি তার অসহায়ত্বকেও দেখান। মধুসূদন খুব লজিক্যালি এবং কার্যকারণসূত্র দিয়ে বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন। এখানেই বাল্মীকির সঙ্গে মধুসূদনের পার্থক্য তৈরি হয়ে যায়। রাবণ আধুনিক ব্যক্তিমানুষের মতো প্রবল শক্তিধর নিয়তির কাছে অসহায়। Men propose God disposes প্রবাদটির কথা মনে পড়ে যায়। রাবণ যা যেভাবে ভেবেছিল তা সেভাবে হয় না। সীতাহরণের ফল হিসেবে তাকে রাজ্যই হারিয়ে ফেলতে হয়। সে জানে না দেবতাদের উদ্দেশ্য। এই সঙ্গে সীতা সেটাও আমাদের শোনান, "দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী/ মা আমার! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী/ কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী, –/ 'বিধির ইচ্ছায় বাছা, হরিছে গো তোরে/ রক্ষোরাজ, তোর হেতু সবংশে মজিবে/ অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি,/ ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে/ যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্ম্মতি/ রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি/ এত দিনে মোর প্রতি; আশীবিনু তোরে!/ জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথিলি!"[২০]

এরপর একধরনের বিমূঢ় অসহায়ত্ববোধে পাঠকও আক্রান্ত হয়। রাবণ দেবতাদের এই আয়োজন জানে না। যেমন জানে না আধুনিক মানুষ তার ললাট লিখন। সে লড়ে যায় এক অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে। কখনো জেতে আর কখনোবা পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করে। এই অংশে সীতা তার মানসনেত্রে রাবণের পরাজয় দেখে এবং সেটার চিত্র সরমার কাছে বর্ণনা করে। আর পরের সর্গগুলোতে রাবণ তার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা বিধির বিধানের বিরুদ্ধে লড়ে যায় আর একে একে সব হারাতে থাকে। এই সর্গে মধুসূদন রাবণের ডুয়িং দেখানোর পাশাপাশি তার সাফারিং-এর একটা চিত্র ফুটে তুলেছেন। রাবণের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ স্পষ্ট। রাবণের ট্রাজেডি তাঁর কলমে ভিন্ন এক অনুভব তৈরি করে। ক্ষেত্র গুপ্ত বলেন,

---

[১৯] বিষ্ণু বসু ও তীর্থপতি দত্ত (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৭-৬৮।

[২০] *তদেব*, পৃ. ৬৯।

"বিশেষত নায়কের পাপ এই চতুর্থ সর্গে ভর্ৎসনার রঙে অঙ্কিত। পাপবিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাবণের নায়কত্ব ও মহিমা প্রদর্শনই মেঘনাদবধের একটি সুগভীর নবীনতা।"[২১]

পঞ্চম সর্গে দেখা যায় লক্ষ্মণ দেবতাদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের উদ্দেশ্যে আসে। মধুসূদন বলছেন, "কহিলেন মহামায়া; "সুপ্রসন্ন আজি,/ রে সতী-সুমিত্রা-সুত, দেব দেবী যত/ তোর প্রতি! দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে/ বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা/ সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।/ ধরি, দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,/ যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি,/ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।"[২২] এখানে আমরা দেখি চতুর্থ সর্গে দেবতাদের যে ইচ্ছের প্রসঙ্গের অবতারণা হয়েছে তার প্রয়োগ। স্বয়ং মহামায়া মর্ত্যে নেমে এসেছেন দেব-অস্ত্র দেওয়ার পরও। যাহোক, পরের অর্থাৎ ষষ্ঠ সর্গে মধুসূদন বেশ আয়োজন করে তাঁর প্রিয় মেঘনাদের বধ হওয়ার আখ্যান শোনান। কীভাবে মায়াবলে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করতে আসে এবং ধরাশায়ী হয়েও তাকে দেবতাদের কল্যাণে বধ করতে সমর্থ হয় সেই বিবরণ আমরা দেখি। মেঘনাদ বধ হলেও মধুসূদনের মেঘনাদ পরাজিত হয় না। বরং সৌমিত্রকেশরী লক্ষ্মণের মেরুদণ্ডহীনতা পাঠকের মনে বাজে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র মেঘনাদকে বধ করতে উদ্যত লক্ষ্মণকে দেখে মেঘনাদ বলে, "সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু/ লক্ষ্মণ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব/ মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু/ রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,/ তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে–/ রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।/ সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,/ নহে, রথীকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।/ এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,/ ক্ষত্র তুমি, তব কাছে; –কি আর কহিব?"[২৩]

কিন্তু মেঘনাদের এই বিনয় আর বীরধর্মের প্রত্যুত্তরে লক্ষ্মণ বলে, "মারি অরি, পারি যে কৌশলে!"[২৪] মেঘনাদ তখন ভাবে এবং জিজ্ঞাসাও করে কীভাবে এই যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ প্রবেশ করলো। এবং চোখের নিমিষে কোষা তুলে লক্ষ্মণের শিরে আঘাত করে। এতে সে মাটিতে পড়ে যায়। লক্ষ্মণের দেব-অসি দিয়েই তাকে আঘাত করতে উদ্যত হয় মেঘনাদ ঠিক তখন শূল হাতে বিভীষণ উপস্থিত হয়। মেঘনাদ বিস্মিত হয়ে বলে, "এত ক্ষণে"–অরিন্দম কহিলা বিষাদে-/ "জানিনু কেমনে আমি লক্ষ্মণ পশিল/ রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিৎ কি তব/ এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,/ সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলীশম্ভুনিভ/ কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী?/ নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?/ চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে? কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরু জন তুমি/ পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,/ পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,/ লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভুঞ্জিব আহবে।"[২৫]

---

[২১] ক্ষেত্র গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৩।

[২২] বিষ্ণু বসু ও তীর্থপতি দত্ত (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৭।

[২৩] *তদেব*, পৃ. ৮৭।

[২৪] *তদেব*।

[২৫] *তদেব*।

শেষাবধি মেঘনাদের অস্ত্রাগারে যাওয়া হয় না। মায়ার বলে চেতন ফিরে পায় লক্ষ্মণ এবং দেব-অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে মেঘনাদকে। মধুসূদন বলছেন, "ত্যজি ধনুঃ, নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ/ রামানুজ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে/ নয়ন! হায়রে, অন্ধ অরিন্দম বলী/ ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে/ শোণিতার্দ্র। থরথরি কাঁপিল বসুধা;/ গর্জ্জিলা উথলি সিন্ধু! ভৈরব আরবে/ সহসা পূরিল বিশ্ব! ত্রিদিবে, পাতালে,/ মর্ত্ত্যে, মরাময় জীব প্রমাদ গণিলা/ আতঙ্কে!...."[২৬] মৃত্যুর আগে মেঘনাদ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে যায়, "রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে!/ কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,/ পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে!/ দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে/ মরিতে এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?/ আর কি কহিব তোরে? এ বারতা যবে/ পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,/ নরাধম?..../ দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন/ ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে?/কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,/ কলঙ্কি?...."[২৭] একজন আত্মবিশ্বাসী সাহসী মানুষের কথার প্রকাশ ঘটেছে এখানে। এ কারণেই আমরা বলছিলাম মেঘনাদ নিহত হলেও তার পরাজয় ঘটেনি। উদ্ধৃতির চিহ্নিত অংশটুকুতে লক্ষ্মণকে 'কলঙ্কি' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই আখ্যানে রাম এবং লক্ষ্মণ আসলে নিজের প্রচেষ্টায় কিছুই করে না। তারা যেন সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষ। যাদের সবকিছু হাতের মুঠোয়। রাম বারবার বলেছে "নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি,/ ফিরি যাই বনবাসে!...."[২৮]

অবশ্য লক্ষ্মণ দেবতাদের ভরসায় আর বিভীষণের প্রতি আস্থায় সীতা উদ্ধারের জন্য মেঘনাদকে বধ করতে আসে। তার আত্মবিশ্বাস কতটুকু ছিল সেটা বিচার্যের খুব বেশি সুযোগ নেই। যে কোষার আঘাতে চেতনা হারায় আবার মায়ার বলে তা ফিরে পায়। এখানে আমরা মেঘনাদের মধ্যে দেখি রক্ত-মাংসের মানুষের লড়াকু প্রবণতা। সে তার অসম সাহসিকতায় লক্ষ্মণকে প্রায় হারিয়েই দিয়েছিল। কিন্তু বিধির বিধান খণ্ডাতে পারে না। এই সর্গ সম্পর্কে বলা হয়, "ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের মৃত্যু। একে কেন্দ্রে রেখেই ঘটনাবর্ত। এটি কাব্যকাহিনীর চরম মুহূর্ত। যা কিছু সাধনা, যা কিছু পরিবেশ-রচনা, যা কিছু কার্যকারণের সম্পর্ক-নির্ণয়ের চেষ্টা পূর্ববর্তী সর্গপঞ্চকে ঘটেছে (তাদের বর্ণনার পল্লবিত সৌন্দর্যকে বাদ দিয়ে) তা যেন এই ষষ্ঠ সর্গের দিকেই অঙ্গুলিসঙ্কেত করে আছে।"[২৯]

মেঘনাদবধ কাব্যের সপ্তম সর্গ পুত্র শোকাতুর রাবণের যুদ্ধযাত্রা এবং লক্ষ্মণকে বধ করার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। বলা যায় এখানে তীব্র প্রতিশোধপরায়ণতাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু পরের সর্গ অর্থাৎ অষ্টম সর্গে দেখা যায় ভীমাঘাতে মৃত লক্ষ্মণ পুনরায় জীবন দিতে অগ্রজ রাম শিবের আদেশে যমালয়ে যায়। সশরীরে রাম সেখানে যায় পথ দেখাতে সঙ্গে শূলহস্তে মায়াদেবী। যমালয়ে পিতা দশরথ বলে দেন লক্ষ্মণের জীবন ফিরে পাবার

---

[২৬] *তদেব*, পৃ. ৮৯।

[২৭] *তদেব*।

[২৮] *তদেব*, পৃ. ৮২।

[২৯] ক্ষেত্র গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৩-১৫৪।

উপায়। বলেন, "... পাইবে লক্ষ্মণে,/ সুলক্ষণ! প্রাণ তার এখনও দেহে/ বদ্ধ, ভগ্ন কারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা।/ সুগন্ধমাদন গিরি, তার শৃঙ্গদেশে/ ফলে মহৌষধ, বৎস, বিশল্যকরণী,/ হেমলতা; আনি তাহা বাঁচাও অনুজে।/ আপনি প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি/ দিলা এ উপায় কহি।.... "[৩০]

এই সর্গের আরও উদ্দেশ্য রয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়। যমালয়ে সশরীরে রাম প্রবেশ করে আর এর বীভৎস রূপের বর্ণনা মধুসূদন যথেষ্ট মুন্সীয়ানার সঙ্গে উপস্থাপন করেন। হয়তো এধরনের উপস্থাপনায় পাশ্চাত্যের প্রভাব রয়েছে কিংবা সেখান থেকে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আরেকটি বিষয় এখানে জরুরি, লক্ষ্মণের জীবনপ্রাপ্তির এই বিশাল আয়োজনের বর্ণনার কতটা প্রয়োজন ছিল? এ প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেন:

> রামায়ণের পূর্ণাঙ্গ কাহিনীতে লক্ষ্মণের জীবনলাভ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে জীবনপ্রাপ্ত লক্ষ্মণকে আর একটি বারও কাব্যকাহিনীর মধ্যে দেখা যায় নি। তবে কি কারণে তাকে বাঁচিয়ে তোলা হয়? . . . কত শক্তিধর কিন্তু কত অসহায় রাবণ, এই একটি কথা আবার নতুন করে মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল। বীরপুত্র মেঘনাদকে রক্ষা করতেই সে শুধু অসমর্থ নয়, পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধগ্রহণের সামান্য আত্মতৃপ্তিও তার আর মিলল না। 'বিধির এ বিধি' মেঘনাদবধ যেমন রাবণের আত্ম-অবক্ষয়ের ট্রাজিকবোধকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিল, লক্ষ্মণের জীবনপ্রাপ্তির সংবাদ তেমনি পুত্রের মৃত্যুর বেদনার সঙ্গে আপনার নিরুপায় অবস্থাকে মিলিয়ে এক মহাশূন্য হতাশান্ধকারে তাকে নিক্ষেপ করল।[৩১]

শেষ অর্থাৎ নবম সর্গে রাবণকে লক্ষ্মণের জীবনপ্রাপ্তির খবর দিতে গিয়ে মন্ত্রিবর বলেন, "কে বুঝে দেবের মায়া ও মায়াসংসারে,/ রাজেন্দ্র? গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি,/ দেবাত্মা, আপনি আসি গত নিশাকালে,/ মহৌষধ-দানে, প্রভু, বাঁচাইলা পুনঃ/লক্ষ্মণে;.... "[৩২]

রাবণের হাহাকার আর অসহায়ত্ব ঝরে পড়ে এভাবে, "বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা সুরথী/ লঙ্কেশ–"বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে?/ বিমুখি অমর মরে, সম্মুখ-সমরে/ বধিনু যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ/ দৈববলে? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে,/ ভুলিনা স্বধর্ম্ম আজি কৃতান্ত আপনি!/ ... মরিল সংগ্রামে/ শূলীশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,/ কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে/ শক্তিধর! প্রাণ আমি ধরি কোন্ সাধে?"[৩৩] রাবণের এই শোকোন্মত্ততা একজন বীরের। যার সবকিছু থাকার পরও নিঃস্ব হয়ে যেতে হয় বিধির বিধানে। প্রিয় লঙ্কাপুরী 'বীরশূন্য তবে বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা!'[৩৪] শেষ অবধি মন্ত্রী সারণকে দিয়ে রামের কাছে বার্তা

---

[৩০] বিষ্ণু বসু ও তীর্থপতি দত্ত (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১১।

[৩১] ক্ষেত্র গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১১-১১২।

[৩২] বিষ্ণু বসু ও তীর্থপতি দত্ত (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১১-১১২।

[৩৩] *তদেব*, পৃ. ১১২।

[৩৪] *তদেব*, পৃ. ১১৬।

পাঠায় রাবণ যে সে তাঁর বীরপুত্রের সৎক্রিয়া করবে সাতদিন ধরে। এসময় যেন বীরধর্ম মাথায় রেখে বৈরিভাব পরিহার করে রাম। ইন্দ্রজিৎ-এর সঙ্গে তাঁর প্রেমময়ী স্ত্রী প্রমীলা সুন্দরী চিতায় আরোহন করে। যাওয়ার আগে বলে যায়, "... যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে/ পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে;—/ পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?"[৩৪] এবং কেবল রাবণ নয় আখ্যানের শেষ কথাটি হলো, "বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে/ সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।।"[৩৫]

মেঘনাদবধ কাব্যের সমাপ্তি এখানেই। অনেকগুলো অনুষঙ্গ নিয়ে আলাপ হতে পারে এই কাব্যের। যেমন: এর মহাকাব্যিকতা, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য প্রভাব, শৈলীগত পরিচর্যা প্রভৃতি। আমরা এই আলাপে কেবল একটা দিকে ফোকাস রাখার চেষ্টা করেছি। নিখুঁত ৮ ও ৬ মাত্রার অমিত্রাক্ষর ছন্দের এই লেখাটির নন্দনভাষ্য তথা শিল্পস্বরের আধুনিকতাই আমাদের আলাপের মূল অনুষঙ্গ। আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি চরিত্রের পরিকল্পনায় তথা আখ্যানভাগের নির্মাণে মধুসূদন কীভাবে আজকের ব্যক্তিমানুষকে জায়গা করে দিয়েছেন। এবং এখানেই তাঁর সঙ্গে, তাঁর লেখার সঙ্গে রামায়ণের পার্থক্য তৈরি হয়ে যায়। মধুসূদন যে কালে জন্মেছেন সেকালে একটা নতুন স্বর কেবল গুঞ্জরিত হয়ে উঠছিল। তার আভাস মধুকবি বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করেন। বাংলা সাহিত্যে তখন পর্যন্ত যার প্রচণ্ড অভাব চলছিল অর্থাৎ দেবতাদের সন্নিবেশিত আনাগোনায় মুখর সাহিত্যের অঙ্গন। রক্তমাংসের ব্যক্তিমানুষ তখনও উপেক্ষিত। আধুনিকতার যে প্রকাশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তার বিপুল সমারোহ এখানে। রাবণ, মেঘনাদ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আরও আছে চিত্রাঙ্গদা, মন্দোদরী, প্রমীলা এবং এদের সঙ্গে সীতা। নারীর ব্যক্তিত্বময়ী রূপটাও সযতনে এঁকেছেন মধুসূদন।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রাণ অযুত জীবনের প্রতীক রাবণ। রাবণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত—এই কাব্যের মূল বিষয় হলেও এখানে কোথাও সেই পাপের অবতারণা ব্যাপকভাবে করা হয়নি। রাবণের মধ্যেও সেই পাপবোধের প্রকাশ সে অর্থে নেই। মহিষী চিত্রাঙ্গদা পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুতে তাকে দোষারোপ করলে তিনি বরং একজন প্রজাবৎসল শাসকের ন্যায় বলেন শত পুত্রশোকে তিনি কাতর। রাবণের আচরণে দুরাচার বা অসদ্ভাব কিছু দেখা যায় না। যা দেখা যায় তা হলো একজন আত্মশক্তিতে বলীয়ান সংবেদনশীল মানুষ। যিনি ঈশ্বরের কাছে বারবার সব অদ্ভুত ঘটনার জন্য প্রশ্ন তুলেছেন। তার হাহাকারে পাঠককুলের হৃদয় মথিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে, এই রাবণ উনিশ শতকের একজন মানুষ। যার স্রষ্টা মধুসূদন দত্ত। সমালোচক বলছেন:

> ধর্ম্মের চক্ষে রাবণ পাপী, এ কাব্যে আমরা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তই দেখি, পাপ দেখি না; কবি যেন পাপ হইতে মানুষকে পৃথক কইরা লইয়াছেন—দুঃখের অনলমধ্যে, মানুষের প্রাণের আয়স-ধাতুকে প্রদীপ্ত লোহিত মূর্ত্তিতে প্রকটিত করিয়াছেন; তাহাতে পাপের সে কৃষ্ণ-বর্ণ আর নাই, কেবল হৃৎপিণ্ডের কোমল উজ্জ্বল রূপই উদ্ভাসিত হইয়াছে। অপর

[৩৫] *তদেব*, পৃ. ১১৭।

> পক্ষে, রাম-বিভীষণ প্রভৃতির সমাজে–এই পাপ-বোধ, ধর্ম্মভীরুতা, ও দেব-সেবার যে ভাব কবি, ঘটনায় ও চরিত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা স্থানে স্থানে স্পষ্ট অশ্রদ্ধার উদ্রেক করে।[৩৬]

মানবতার আবেগে ভরপুর রাবণ। ইন্দ্রজীয় পুত্র মেঘনাদের সৎকারের সময় তার কণ্ঠে ঝরে পড়ে এক পিতার গভীর অনুভব, "ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে/ এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে; –/ সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব/ মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি– বুঝিব কেমনে/ তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!/... সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,/ লভিতে কি এই ফল?..../ ... কি পাপে লিখিলা/ এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?"[৩৭]

রাবণের এই অসহায়ত্বের সঙ্গে আধুনিক ব্যক্তিমানুষের জীবনের মর্মন্তুদ লড়াই নিহিত আছে। আছে ব্যক্তি মধুসূদনের জীবনেরও অতৃপ্তি। বলা হয়ে থাকে মধুসূদন এক অলিখিত মহাকাব্যের মহাকবি। যা রচনা করার ইচ্ছা, পরিকল্পনা, প্রস্তুতি থাকলেও বাস্তবতা দেয়নি। জীবনের শেষ প্রান্তে দ্রুত উপনীত হন মধুসূদন। কীভাবে যেন ভাগ্যলিপি তাঁর সঙ্গেও রাবণের মতোই প্রতারণা করে বসে। তার অন্তরের কাতরতা যেন রাবণের মধ্য দিয়ে প্রকটিত। 'সমগ্র জীবনভর তিনি মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাঁচার জন্যে কি না প্রচেষ্টা করেছেন! কিন্তু এক দুর্জ্ঞেয় ভাগ্যের অঙ্গুলি হেলনে তাঁকে চূড়ান্ত পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে।'[৩৮] যেমনটা করেছে রাবণ। রাবণের মধ্যে আমরা জাতীয়তাবাদী চেতনা ও মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন এবং পৌরুষদীপ্ত মানুষকে দেখি। যা এই কাব্যের আধুনিকতার পরিচয়কে আরেকটু সমৃদ্ধ করে। মধুসূদনের প্রিয় আরেক চরিত্র মেঘনাদ। যার মধ্যে ছিল এক অতুলনীয় আবেগ, বীরত্ব, ব্যক্তিত্ববোধ। মধুসূদন মেঘনাদের বধ নিয়ে যা বলেছিলেন এবং সেই সঙ্গে সমালোচকের বিশ্লেষণ এমন :

> "I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit"–এই সামান্য উক্তিটির মধ্যে তাঁহার নিজেরও অজ্ঞাত এক অভিনব প্রেরণার ইঙ্গিত রহিয়াছে। আর্য্য রামায়ণে ইন্দ্রজিতের চরিত্রে তিনি যে পৌরুষ-বীর্য্যের আভাস পাইয়াছিলেন, . . . তাহারই বীজ তাঁহার মগ্নচৈতন্যে উপ্ত থাকিয়া এতদিনে অঙ্কুরিত হইয়াছে। এমন আত্মশক্তিমান নির্ভীক পৌরুষের সাক্ষাৎ তিনি বোধ হয় আর কোথায়ও পান নাই এবং ঘটনাক্রমে পাইয়া তিনি এক অপূর্ব্ব আত্মস্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়াছিলেন; বাহিরের সর্ব্বসংস্কার ভেদ করিয়া এই চরিত্রের গৌরব তাহার অন্তরতম আত্মচেতনা প্রবুদ্ধ করিয়াছিল।[৩৯]

রাবণ ও মেঘনাদের পাশে রাম ও লক্ষ্মণ অনেকটা নিষ্প্রভ। যদিও হাজার বছরের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি শেষোক্ত দুজনের জন্যই বরাদ্দ মানুষের মনে। এখানে দেবতাদের আশীর্বাদপুষ্ট

---

[৩৬] মোহিতলাল মজুমদার, *কবি শ্রী মধুসূদন* (কলকাতা: বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮), ৭ম সং, পৃ. ৫২।

[৩৭] বিষ্ণু বসু ও তীর্থপতি দত্ত (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৬।

[৩৮] মোবাশ্বের আলী, *শিল্পীর ট্র্যাজেডি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), পৃ. ৬৯।

[৩৯] মোহিতলাল মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬২।

হয়ে রাম ও লক্ষ্মণ যেন সমাজের সেসব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে বসেছে যারা অঢেল ক্ষমতা আর পয়সার মালিক হয়ে ছড়ি ঘোরায় সর্বসাধারণের উপর। রামকে বারবার তার কাপুরুষতার পরিচয় দিতে দেখা যায়, এমনকি সীতার উদ্ধারের ব্যাপারে সে অনীহাও দেখায়। সে তুলনায় লক্ষ্মণের কিছুটা আত্মবিশ্বাসী রূপ চোখে পড়ে। বিষয়টা এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়, রাবণ ও মেঘনাদের বীরত্বকে বাড়িয়ে দিতে তাদের ব্যাপারে কবির মনোযোগ কম পড়েছে। যদিও লক্ষ্মণকে একেবারে পুতুল না করে তার বীরত্বব্যঞ্জক প্রকাশ দুএকবার উপস্থাপিত হয়েছে। আসলে মধুসূদনের কল্পনার দুই চরিত্র রাবণ আর মেঘনাদ। যাদের মধ্যে কবিমানসের সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। এরা যেন এই যুগেরও ফসল। এই কালের চাহিদা থেকে তাদের জন্ম।

মধুসূদনের চরিত্র বিনির্মাণে বাঙালিয়ানার প্রকাশ দুর্লক্ষ্য নয়। তাঁর নারীচরিত্রের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে। সরমা, সীতা, মন্দোদরী একেবারে খাঁটি বাঙালি নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে। যদিও সেক্ষেত্রে চিত্রাঙ্গদা এবং প্রমীলাকে একটু ভিন্নভাবে দেখার অবকাশ রয়েছে। রাজমহিষী চিত্রাঙ্গদা বীরপুত্র বীরবাহুর মৃত্যুতে রাজদরবারে এসে স্বয়ং রাজাকে ভর্ৎসনা করে। পুত্রের মৃত্যুকে শোকোন্মত্ততা নয় যুক্তি দেখিয়ে বলে রাজার ধর্ম সকলকে রক্ষা করা—তাহলে তার পুত্র কোথায়? তখন একনিমিষেই এই নারী স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন। তার ব্যক্তিত্বের ছটা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এভাবে প্রমীলাকেও আমরা ব্যক্তি হয়ে উঠতে দেখি। তার প্রমোদভবন থেকে লঙ্কায় প্রবেশের সময় নিজের পরিচয় দানে যে দৃঢ়তা দেখা যায় বা রণসাজে সজ্জিত হওয়ার মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস দেখা যায় তা অভিনব। তার প্রেম সাধারণ গার্হস্থ্যপ্রেমকে ছাড়িয়ে ভিন্ন এক মাত্রায় উপস্থাপিত। তার প্রেমের মধ্যে নতুন এক আদর্শের প্রকাশ লক্ষণীয়। প্রমীলার চিতায় আরোহণ ও সেটারই বহিঃপ্রকাশ যা ভারতীয় ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যতটা না সাজুয্যপূর্ণ তার চেয়ে বেশি তার প্রেমময় সত্তার প্রকাশে। সে প্রেমিকা নারী। প্রিয়তমকে ছাড়া তাঁর জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত। সে কারণেই স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে সে বরণ করেছে। বলা হয়ে থাকে, "প্রমীলার চরিত্রে কবি আমাদের দেশের মূক দাম্পত্য-প্রেমকে যে মুখরতা দান করিয়াছেন, এবং তাহারই যে দুঃসাহস, তাহাতেই নবযুগের নবসাহিত্যের সূচনা হইয়াছে; এই মুখরতাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকাব্যে দাম্পত্য-প্রেমকে নূতন করিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।"[৪০] সীতা চরিত্রে নতুন কোনো আদর্শকে প্রযুক্ত করেননি মধুসূদন কিন্তু প্রমীলার মধ্যে পুরাতনের সঙ্গে নতুনের মিশ্রণে এক অভিনব সৃষ্টি করে ফেলেন। "দেশী ও বিলাতী দাম্পত্যের দুই বিভিন্ন আদর্শকে, তিনি যেন এক আশ্চর্য্য রাসায়নিক যাদুশক্তিতে একাধারে মিলাইয়াছেন। প্রমীলার চরিত্রে স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকার সঙ্গে বাঙালী কুলবধূ, এবং ভারতীয় আদর্শের শক্তিরূপা নারীর সঙ্গে অভারতীয় বীরাঙ্গনা-মূর্ত্তির এই যে সংযোজন, ইহারই প্রতিভা সে যুগের বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করিয়াছিল।"[৪১]

---

[৪০] *তদেব*, পৃ. ৯১।

[৪১] *তদেব*, পৃ. ৮৬।

সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাঁর *কবি শ্রী মধুসূদন* বইয়ে দেখিয়েছেন মধুসূদন অসাধারণভাবে বাঙালিয়ানাকে ধারণ করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনে বাংলার কবি হয়ে এই কাব্য লিখেছেন। তাই তার মধ্যে বীর রসের চেয়ে করুণ রস বেশি জায়গা পেয়েছে। এসব সত্যকে মাথায় রেখে বলা যায় মধুসূদন তাঁর *মেঘনাদ বধ* "কাব্যে পুরুষের পৌরুষের সঙ্গে নারীর নারীত্বকেও তাহার শ্রেষ্ঠ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন... 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র কাব্যবস্তু যেমনই হউক–বিজাতীয় আদর্শের সঞ্জীবনী প্রেরণা তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় যতই সহায়তা করুক, কবি যে তৎসত্ত্বেও তাঁহার কবিতাকে কুলত্যাগিনী হইতে দেন নাই, ইহাই মধুসূদনের কবিশক্তির সবচেয়ে বড় নিদর্শন; এবং এইজন্যই সেকালের শিক্ষিত বাঙালীমাত্রেই এ কাব্যের রস আকণ্ঠ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল।"[৪২] না, কেবল পরিতৃপ্ত নয় সেকালের বাঙালি পাঠকের সঙ্গে লেখকসমাজও নতুন এক দিকনির্দেশনা পেয়ে যায়। নতুন দিনের উদ্বোধনে সাহিত্যের আকাশে পুষ্পবৃষ্টি ঝরতে থাকে। মানবতার জাগরণে সাহিত্যের আকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যদিও তৎকালীন সমাজ কিছু পূর্ব থেকে মহাত্মা রামমোহনের হাত ধরে নতুন চিন্তার সাক্ষী হয়েছিল। কিন্তু কাব্যের জগতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার প্রতিধ্বনি হলো বিলম্বে। রামমোহনের তিরোভাবের ত্রিশ বৎসরের পর সাহিত্যজগতে মধুসূদনের আবির্ভাব। মানবিকতা, সম-অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের মন্ত্র তিনি শোনালেন দুর্দান্ত তেজের সঙ্গে। পরবর্তী বাংলা কাব্যকে নতুন পথে চলতে আর ইতস্তত করতে হয় নি।[৪৩]

সাহিত্যে আধুনিকতার উদ্বোধক, চেতনায় বিপ্লবী, মননে প্রজ্ঞাময় সৃষ্টিশীল মধুসূদন এক নবযুগের সন্তান। মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষাপ্রাপ্ত রুদ্র সাধক। জীবন থেকে জীবনের পাঠ নিয়ে পুরাতনকে কখনো অঙ্গীকৃত করে, কখনোবা দূরে ঠেলে নবজীবনের বার্তা শোনালেন আমাদের। পয়ারের বন্ধন থেকে যেমন মুক্ত করলেন বাংলা কবিতাকে, ঠিক তেমনই কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনবোধেও মুক্তি আনলেন। যদিও বলা হয় তাঁর কবিমানসে জীবনের রহস্যের উপলব্ধি কম, কিন্তু তিনি তো বাঙালির চিন্তনের ক্ষেত্রে নবজাগরণ ঘটিয়েছেন।

বাঙালির জাতীয় জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভাব মধুসূদনের। পুরোনো বিশ্বাসের ভাঙন আর নতুন বিশ্বাসের পদচারণায় দ্বিধাগ্রস্ত সমাজে মধুসূদন সাড়ম্বরে নতুন বিশ্বাসকে সাহিত্যে জায়গা করে দিলেন। তাঁকে যুগন্ধর মধুসূদন হয়তো এই কারণেই বলা হয়। প্রাচ্যের লোকপ্রিয় মিথ রামায়ণকে পুনর্নির্মাণ করতে গিয়ে পুরোনোর আদলে ভরে দিলেন নতুন দিনের নতুন মানুষকে। যাদের জন্মও হয়তো সেই উনিশ শতকীয় সমাজে তখনও পুরো রূপ পায়নি। মধুসূদন মূল রামায়ণকে অঙ্গীকৃত করেই নবচেতনার জাগরণ ঘটালেন রাবণ, মেঘনাদ, প্রমীলাদের মধ্যে। যাদের আত্মবিশ্বাস, লড়াকু মনোভাব, মানবতাবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ অমিত শক্তিধর বিধির সঙ্গে। বিধির বিধানের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনের

---

[৪২] *তদেব*, পৃ. ৯৭।

[৪৩] সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবন ও সাহিত্য* (কলকাতা: পুথিপত্র প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭), ৩য় সং, পৃ. ২৩০।

জয়গানে মুখর হয়ে উঠল *মেঘনাদবধ কাব্যের* অবয়ব। উন্মুল নয় গভীরে প্রোথিত তাদের জীবন আর জীবনের পথ চলা। তাই কোনোভাবেই আধুনিক ব্যক্তিমানুষের জীবন থেকে আলাদা করা যায় না রাবণ, মেঘনাদ, প্রমীলাদের। তাদের আপাত পরাজয়ের মধ্যে নিহিত আছে রক্ত-মাংসের মানুষের জীবনের কথকতা। তাই এই পরাজয়ও এক অর্থে গৌরবের। *মেঘনাদবধ কাব্যের* শিল্পস্বর একেবারে অভিনব। এই স্বর আধুনিকতার কথা বলে, বলে জীবনের কথা। যুগপ্রবর্তক মধুকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ কাব্য* আধুনিক জীবনবোধের শৈল্পিক উপস্থাপনা তথা আধুনিকতার শিল্পস্বর—এই সিদ্ধান্তে আসাই যায়।